

মুখতার যাদুল মা'আদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ সমূহের সূচী ও বিবরণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)

নাম ও কুনীয়ত (উপনাম) রাখা সম্পর্কে নাবী (সাঃ) এর সুন্নাত

নাবী (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ঐ ব্যক্তির নাম যে নিজের নাম মালিকুল আমলাক তথা শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ রাখল। কেননা আল্লাহই একমাত্র বাদশাহ। তিনি আরও বলেন- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অধিক প্রিয় নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। সবচেয়ে অধিক সুন্দর নাম হচ্ছে, হারিছ ও হাম্মাম এবং মন্দ নাম হচ্ছে হার্ব (যুদ্ধ) ও মুরী (তিজ্ঞ)। নাবী (ﷺ) আরও বলেন- তোমরা ছেলে সন্তানের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজিহ এবং আফলাহ রাখবেন। কেননা হয়ত তোমরা কখনও বলবে যে এখানে সে (ইয়াসার বা রাবাহ বা নাজিহ বা আফলাহ) আছে কি? সে যদি সেখানে না থাকে তাহলে বলা হবে নাই।[1]

মন্দ নামকে ভাল নামে পরিবর্তন করা তার পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাবী (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি عاصية আসীয়া (পাপী) নাম পরিবর্তন করে জামীলাহ নাম রেখেছেন। উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাঃ) এর পূর্বের নাম ছিল বারী (পূণ্যবান)। নাবী (ﷺ) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জুওয়াইরিয়া। যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন- নাবী (ﷺ) বরী নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

আর তিনি বলেছেন- তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবী করোনা। কেননা আল্লাহই ভাল জানেন তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র।[2] তিনি আবুল হাকামের নাম পরিবর্তন করে আবু গুরাইহ রেখেছেন। আর তিনি আসরামের নাম বদল করে যারআ রেখেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়েব (রাঃ) এর দাদার নাম ছিল হাফ্ব (শক্ত মাটি)। তিনি তা পরিবর্তন করে রাখলেন সাহু (নরম ভূমি), যাতে চলাচল করা সহজ এবং যা চাষাবাদের জন্য উপযোগী।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) আস (পাপী-অবাধ্য), আযীয (শক্তিশালী-কঠিন), আতলা (অবাধ্য), শয়তান (অভিশপ্ত-বিতাড়িত), হাকাম (মহা জ্ঞানী), গুরাব (কাক), হুবাব, শিহাব (অগ্নিপিণ্ড) ইত্যাদি নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি শিহাবের নাম পরিবর্তন করে হিশাম রেখেছেন। হারব (যুদ্ধ)-এর নাম বদল করে সিল্ম (শান্তি) রেখেছেন। মুযতায়ি (ঘুমন্ত-শায়িত)-এর নাম পরিবর্তন করে মুনবাইছ (জাগ্রত) রেখেছেন। তিনি সাদা যমীনের নাম বদল করে সবুজ যমীন নাম করণ করেছেন। গোমরাহীর ঘাটিকে পরিবর্তন করে হিদায়াতের ঘাটি হিসেবে নাম দিয়েছেন। বনু মুগবীয়া (গোমরাহ সম্প্রদায়)এর নাম বদল করে বনু রিশদাহ তথা জ্ঞানী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত সম্প্রদায় বলে নাম দিয়েছেন। (মূলতঃ কোন মানুষ, বস্তু বা স্থানের এমন নাম রাখাকে তিনি অপছন্দ করতেন, যা মানুষের কাছে অপছন্দনীয় অর্থ বহন করে বা অপছন্দনীয় কোন অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে)।[3]

বস্তুর নাম যেহেতু বিশেষ অর্থ বহন করে, তাই নাম ও নামকরণকৃত বস্তুর মাঝে গভীর সম্পর্ক থাকা জরুরী। সুতরাং কারও নাম যেন এ রকম না হয় যে, নামের অর্থ হচ্ছে এক রকম আর সেই ব্যক্তির চরিত্র ও আচার-আচরণ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এটি এমন বিষয়, যা মানুষের বিবেক ও স্বভাব মেনে নেয়না।[4] ব্যক্তির নাম

তার ব্যক্তি সত্তার উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে।

মানুষও তার ভাল বা খারাপ, উচ্চ মানের বা নিম্ন মানের নাম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কোন একজন আরব কবি বলেন- তুমি যদি বিশেষ উপাধী ওয়ালা কোন মানুষকে দেখ তাহলে তার বৈশিষ্ট্য সেই উপাধীর মধ্যেই খুঁজে পাবে।

নাবী (ﷺ) সুন্দর নাম পছন্দ করতেন এবং সুন্দর নাম রাখার আদেশ দিতেন। তাঁর কাছে কোন লোক আসলে তিনি আগমনকারীর নাম ও আকার-আকৃতি সুন্দর হওয়া পছন্দ করতেন। নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থায় তিনি নামের অর্থ উপলব্ধি করতেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ উকবা বিন রাফে-এর ঘরে অবস্থান করছেন। তখন তাদের কাছে ইবনে তাবের তাজা (কাচা-পাকা) খেজুর উপস্থিত করা হল। তিনি এর ব্যাখ্যা করলেন যে, দুনিয়াতে মুসলিমদের শেষ পরিণতি ভাল হবে এবং আখিরাতে তারাই সফলকাম হবে। আর আল্লাহ তাদের জন্য যে দ্বীনকে চয়ন করেছেন, তা নরম ও তাজা খেজুরের ন্যায় খুব সহজ-সরল।

হুদাইবিয়ার দিন সুহাইল বিন আমরের আগমনের মাধ্যমে তিনি কাজটি সহজ হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা সুহাইল নামটি সাহু থেকে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে সহজ। একবার তিনি সাহাবীদেরকে ছাগলের দুধ দোহন করতে বললেন। একজন লোক সেই কাজে অগ্রসর হলে তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলেন- তোমার নাম কি? সে বলল- মুরী (তিজ্জ)। নাবী (ﷺ) তখন বললেন- তুমি বস। এরপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়াল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমার নাম কি? সে বলল- হারব (যুদ্ধ)। তিনি তাকেও বসতে বললেন। আরেক ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি তারও নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল- ইয়া-ঈশ (দীর্ঘ জীবী হবে)। এবার তিনি বললেন- তাহলে তুমি দুধ দোহন কর।

যে সমস্ত জায়গার নাম সুন্দর নয়, তিনি তা অপছন্দ করতেন এবং সেখান দিয়ে পথ চলাও অপছন্দ করতেন। তিনি একবার দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই পাহাড় দুটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল- ফাযেহ (অপদস্তকারী) এবং মুখযি (অপমানকারী)। এ রকম নাম শুনে তিনি সেই রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য পথে চললেন।

একই ব্যক্তির দেহ ও মনের মধ্যে যেরকম সম্পর্ক রয়েছে নাম ও নাম বহনকারী ব্যক্তির মধ্যে তেমনি গভীর সম্পর্ক থাকে। তাই বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোন মানুষের নাম শুনেই তার আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন। এমনভাবে আচার-ব্যবহার ও ব্যক্তির গুণাবলী দেখেই তার নাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারেন। ইয়াস বিন মুআবীয়া এবং আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা কোন লোক দেখেই বলে দিতেন, এই ব্যক্তির নাম এমন হওয়া উচিত, অমুক ব্যক্তির নাম এ রকম হওয়া উচিত বা এ রকম হতে পারে। তাদের অনুমান কখনও ভুল হতনা। এর বিপরীতে নাম শুনেও ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। একদা উমার (রাঃ) একজন লোকের নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল- আমার নাম জামরা (জ্বলন্ত আগ্নেয়)। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমার পিতার নাম কি? সে বলল- শিহাব (অগ্নিশিখা)। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমার বাড়ী কোথায়? সে বলল- হারীতুন নার (যেখানে আগুনের তাপ লাগে)। অতঃপর উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কোন্ অঞ্চলের লোক? সে বলল- লায়ার এলাকায় (জ্বলন্ত আগুন বিশিষ্ট এলাকায়)। এবার উমার (রাঃ) বললেন- গিয়ে দেখো তোমার বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন- সে গিয়ে দেখল ঠিকই তার ঘরবাড়ি জ্বলে গেছে। নাবী (ﷺ) যেমন সুহাইল নাম শুনে কাজ সহজ হয়ে যাওয়ার আশা পোষণ করেছেন। তিনি উম্মাতকে সুন্দর নাম রাখার আদেশ দিয়েছেন। তিনি

এও বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে দুনিয়ার নামেই ডাকা হবে।

হে পাঠক! আপনি চিন্তা করুন, কিভাবে নাবী (ﷺ) এর জন্য আহমাদ ও মুহাম্মাদ নাম নির্বাচন করা হয়েছে, যা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুহাম্মাদ অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত। অর্থাৎ তার মধ্যে উত্তম ও প্রশংসিত গুণাবলী প্রচুর পরিমাণ থাকার কারণে তিনি মুহাম্মাদ আর অন্যের তুলনায় তিনি অধিক প্রশংসাকারী এবং অধিক প্রশংসিত গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান বলে তিনি হচ্ছেন আহমাদ।

এমনি তিনি আবুল হাকামকে আবু জাহেল উপনামে নামকরণ করেছেন, আব্দুল উয়্যাকে আবু লাহাব বলেছেন। কেননা আবু লাহাব অর্থ হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনের পিতা বা আগুন ওয়ালা। কারণ অচিরেই সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে।

নাবী (ﷺ) যখন হিজরত করে মদীনায়ে আসলেন তখন মদীনায় নাম ছিল ইয়াছরিব। নাবী (ﷺ) ইহাকে পরিবর্তন করে মদীনায় নাম রাখলেন তাইবা। কেননা ইয়াছরিব শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে তাছরীব থেকে। তাছরীব অর্থ দোষারোপ করা, তিরস্কার করা ইত্যাদি। আর নাবী (ﷺ) এর আগমনের মাধ্যমে যেহেতু মদীনা এ সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হয়ে গেছে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে তাইবা।[5]

সুন্দর নাম যেহেতু নাম বহনকারীর সুন্দর আচার-আচরণের দাবী রাখে তাই নাবী (ﷺ) কোন কোন আরব গোত্রকে বলেছেন- হে বনী আব্দুল্লাহ! আব্দুল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের নামকে সুন্দর করেছেন।

পাঠক বৃন্দ লক্ষ্য করুন! তিনি কিভাবে এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন? বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের যেই তিন জন লোক প্রথমে মুসলমানদের মুকাবেলা করার জন্য বের হয়েছিল এবং নাবী (ﷺ) মুসলিমদের থেকে যেই তিন জন লোককে তাদের মুকাবেলা করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, তাদের নামগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। তাদের নামগুলো ছিল তাদের অবস্থার অনুরূপ। কাফেররা যাদেরকে নির্বাচন করেছিল তারা হল- অলীদ, উতবা ও শায়বা। অলীদ অর্থ শিশু বা নবজাতক, যার শুরুতেই থাকে দুর্বলতা। শায়বা অর্থ হচ্ছে এমন বৃদ্ধ, যার মধ্যে সকল প্রকার দুর্বলতা একত্রিত হয়। তাদের আরেকজনকে নাম ছিল উতবা (দোষারোপ করা, তিরস্কার করা ইত্যাদি)। তাদের তিনটি নামের মধ্যেই দুর্বলতার অর্থ বিদ্যমান। এতে বুঝা যায় তারা পরাজয়ের ফলে পরস্পর দোষারোপ করবে এবং অচিরেই তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। এই নামগুলোর মুকাবেলায় নাবী (ﷺ) যাদেরকে নির্বাচন করলেন তাদেরকে নিয়ে একটু চিন্তা করুন। তিনি এমন তিনজন লোককে নির্বাচন করলেন, যাদের নামগুলো তাদের চারিত্রিক গুণাবলীর অনুরূপ ছিল। তাদের মুকাবেলা করার জন্য আলী, হামযাহ এবং উবাইদাহ ইবনুল হারিছ (রাঃ) কে নিযুক্ত করলেন। আলী নামটি العلى আল-উলু থেকে গৃহীত। এর দ্বারা উচ্চ মর্যাদা অর্জন, শক্তি ও বিজয় অর্জন বুঝায়। 'উবাইদাহ' আব্দুল্লাহর দাসত্ব বুঝায়। সুতরাং তারা আব্দুল্লাহর ইবাদত, আখিরাতের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম ও বীরত্ব এবং সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে কাফেরদের উদ্দেশ্যে জয়লাভ করেছেন।

আব্দুল্লাহ তা'আলার নিকট সেই নামই অধিক প্রিয় যার অর্থ অধিক উত্তম। তাই আব্দুল্লাহ তা'আলার নামগুলো থেকে আব্দুল্লাহ এবং রহমান নামের দিকে উদ্ভূত হওয়ার তথ্য আবদ শব্দটি যোগ করে আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান নাম রাখা আব্দুল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। এই নাম দু'টি আব্দুল্লাহর নিকট আব্দুল কাদের ও আব্দুল কাহের নাম রাখার চেয়েও অধিক প্রিয়। কারণ বান্দা ও তার রবের মাঝে শুধু ইবাদত ও রহমতের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আব্দুল্লাহ স্বীয় রহমতে বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও পূর্ণতা দিয়েছেন। আর সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাব্বত, ভয় ও

আশা নিয়ে বান্দা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবে।

প্রত্যেক মানুষই যেহেতু স্বীয় ইচ্ছায় নিজেকে পরিচালিত করে আর যেহেতু কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া থেকেই ইচ্ছার সূচনা হয় এবং বান্দার ইচ্ছাতেই কামাই ও অর্জন হয়ে থাকে তাই হারেছ ও হাম্মাম (উদ্যোগী, উদ্যোগী ও পরিশ্রমী) হচ্ছে সবচেয়ে বাস্তব ভিত্তিক নাম। আর প্রকৃত রাজত্ব যেহেতু একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে শাহানশাহ বা রাজাধিরাজ এবং সুলতানুস্ সালাতীন। এই উপাধি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য শোভনীয় নয়। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও জন্য এই উপাধি ধারণ করা বাতিল বা অন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায়কে ভালবাসেন না। কতক আলেম কাযীউল কুযাত পদবী ধারণ করাকেও অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাইয়েদুন নাস (সকল মানুষের নেতা) নাম রাখাও অপছন্দনীয়। কেননা এটি শুধু রসূল (ﷺ) এর জন্য নির্দিষ্ট।

মুরারা (তিজ) এবং হারব (যুদ্ধ) যেহেতু মানুষের নিকট সবচেয়ে অপ্রিয়, তাই এই দু'টি নাম রাখা ঠিক নয়। এর উপর অনুমান করেই হানজালা, হাজন এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম অপছন্দনীয়। নাবীদের চরিত্র যেহেতু সর্বোত্তম তাই তাদের নামগুলোও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তিনি উম্মাতকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন নাবীদের নামে নাম রাখে। সুনানে আবু দাউদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা নাবীদের নামে নাম রাখো। নাবীদের নামে নাম রাখার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরী হবে এবং নাবীদের গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

শিশুর নাম ইয়াসার (সহজ) রাখতে নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে যার দিকে হাদীছে ইঙ্গি করা হয়েছে। কেননা তুমি হয়ত তাকে এই বলে ডাকবে যে, এখানে ইয়াসার আছে কি? লোকেরা হয়ত বলবেঃ এখানে এমন কিছু (ইয়াসার বা সহজ) নেই। আল্লাহই ভাল জানেন, এই অংশ কি হাদীছের? না রাবী কর্তৃক বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেহেতু এ সমস্ত নামের কারণে মানুষেরা শুভ ধারণা করতে পারে, তাই তাদের ধারণাকে খণ্ডন করার জন্যই তিনি এ ধরণের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং উম্মাতের প্রতি দয়াবান নাবী চেয়েছেন যে, তার উম্মাতদেরকে এমন সব মাধ্যম থেকে বিরত রাখবেন, যা তাদেরকে অপছন্দনীয় বিষয় শ্রবণ করতে বাধ্য করবে কিংবা অপছন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন করবে। তা ছাড়া ইয়াসার (সহজকারী), নাজীহ (সফলকাম), রাবাহ (লাভ, লাভবান) ইত্যাদি নাম রাখলে সম্ভাবনা আছে যে, নাম যেই অর্থ বহন করে নামের অধিকারীর ভিতরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত গুণাবলী থাকতে পারে। কোন লোক তার সম্ভানের নাম ইয়াসার (সহজকারী) রাখতে পারে। অথচ সেই সম্ভান এমন হতে পারে যে, সে মানুষের উপর খুবই কঠোর। এমন লোককে নাজীহ (সফলকাম) রাখতে পারে, যার ভিতরে কোন সফলতা নেই এবং এমন লোককেও রাবাহ (লাভবান) রাখতে পারে, যিনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। এ রকম হলে এই গুণগুলো উপরোক্ত নাম বহনকারীদের সাথে সম্পৃক্ত করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে আল্লাহর উপরও মিথ্যারোপ করা হবে। কারণ আল্লাহ্ তাকে সেই গুণাবলী প্রদান করেননি। আরেকটি বিষয় হল তার নাম অনুযায়ী তাকে কাজ করতে বলা হতে পারে। অথচ তার সে রকম কাজ করার ক্ষমতা নেই। পরিণামে তাকে নিন্দা ও বিদ্রম্প করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে ব্যক্তি কবিতা রচনা করতে পারে না তাকে যদি شاعر (কবি) নাম দেয়া হয় এবং কৃপণ ব্যক্তিকে যদি جواد (দানবীর) নাম রাখা হয় তাহলে তাদের নামের দাবী অনুযায়ী কাজ করতে বলা হলে তারা যদি তা করতে না পারে তাহলে অবশ্যই তিরস্কারের সম্মুখীন হবে। কবি বলেন-

লোকেরা মূর্ততা বশতঃ سديد (সঠিক, সৎলোক) হিসেবে নাম রেখেছে। অথচ তোমার মধ্যে কোন সঠিকতা পাওয়া যাচ্ছেনা।

কোন কোন প্রশংসা অনেক সময় নিন্দায় পরিণত হয়, যা প্রশংসা কৃত ব্যক্তির অপমানের কারণ। কেননা মানুষ হয়ত কারও প্রশংসায় এমন গুণ উল্লেখ করে, যা উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই। এর ফলে কেউ তার কাছে সেই গুণের সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় দাবী করতে পারে এই ভেবে যে, তার কাছে উহা বিদ্যমান। যখন তার কাছে সেই গুণটি পাবেনা তখন তাকে গালি দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এ ধরনের লোকদের যদি প্রশংসাহীন নাম রাখা হয় তাহলে কোন সমস্যা হবেনা। আরেকটি কথা হল, যার মধ্যে প্রশংসিত কোন গুণ নেই তাকে যদি প্রশংসিত নামে ডাকা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি এই ধারণা করতে পারে যে, মূলতই সে প্রশংসিত গুণের অধিকারী। ফলে সে নিজেকে মহৎ বলে দাবী করতে পারে। এ জন্যই নাবী (ﷺ) বারী নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই রশীদ (বুদ্ধিমান, জ্ঞানী), মুতী (অনুগত) ইত্যাদি নাম রাখা মাকরুহ।

উপরোক্ত নামগুলো রাখা মুসলিমদের জন্য মাকরুহ। আর কাফেরদেরকে কখনই এ সমস্ত নামে ডাকা যাবেনা এবং তারা নিজেদের জন্য যে সমস্ত সম্মানিত নাম রাখে তা দ্বারাও তাদেরকে সম্বোধন করা যাবেনা।

উপনাম রাখার ব্যাপারে কথা হচ্ছে তা এক প্রকার সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নাবী (ﷺ) সুহাইবের উপনাম রেখেছেন। আবু ইয়াহইয়াহ। আলীর উপনাম রেখেছেন আবু তুরাব। আনাস (রাঃ) এর ছোট ভাই যখন শিশু ছিলেন তখনই তার উপনাম রেখেছেন আবু উমায়ের।

ফুটনোট

[1]. ইয়াসার অর্থ সহজ, রাবাহ, নাজিহ ও আফলাহ-এই তিনটি নামের অর্থ হচ্ছে সফল, সফলতা ইত্যাদি ভাল অর্থ। এই শব্দগুলোর দ্বারা কোন ছেলে সন্তানের নাম রাখতে নিষেধ করার কারণ হল, উপরোক্ত নামে যদি কারও নাম রাখা হয় তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, অচিরেই তাকে উক্ত নাম ধরে ডাকা হবে। বলা হবে এখানে আফলাহ (সফলতা) নাজিহ (সফলকাম) রাবাহ (লাভবান) আছে কি? সে যদি ঐ স্থানে উপস্থিত না থাকে তাহলে অবশ্যই উত্তর আসবে এখানে সে নাই। এই না সূচক উত্তরকে শ্রোতাগণ অশুভ লক্ষণ মনে করতে পারে। অর্থাৎ এখানে সফলতা, সফল লাভবান কোন ব্যক্তি নেই- এ ধরনের কথা লোকেরা কুলক্ষণ মনে করতে পারে। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

[2]. বারী বা এ জাতীয় যে সমস্ত নামের মধ্যে নামকরণকৃত ব্যক্তির পবিত্রতা ও প্রশংসার আভাস রয়েছে সে সমস্ত নাম রাখা ঠিক নয়। এমনি ভাবে দুর্গাম ও নিন্দা বুঝায় এমন নামেও কারও নাম রাখা মাকরুহ। তাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের নাম পরিবর্তন করে ভাল ও সুন্দর নাম রেখেছেন। তিনি এমন নামে সন্তানের নাম করণ করতে বলেছেন, যাতে বিনয়-নম্রতা ও আল্লাহর আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দাস-বান্দা, আব্দুর রাহমান বা রাহমানের গোলাম ইত্যাদি। আর যে সমস্ত নামের মধ্যে শিরক রয়েছে সে সমস্ত নাম থেকে তিনি কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। যেমন আব্দুল হারিছ (শয়তানের বান্দা) আব্দুল মুত্তালেব (মুত্তালেবের বান্দা) ইত্যাদি।

[3]. সৌদি আরবের আল-যুবাইল শহর থেকে আনুমানিক ১০০ কিলোমিটার দূরে একটি অঞ্চলের নাম ছিল رأس الزور। এর সরল বাংলা অনুবাদ হচ্ছে মিথ্যার মাথা। আরবী ভাষায় যার সামান্য জ্ঞান আছে সেও নামটি

শুনেই অপছন্দ করবে। স্থানের নাম মিথ্যার মাথা হয় কিভাবে? তা ছাড়া এই শহরে রয়েছে বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ সম্পদ। এটি ২০০৯-১০ সালের ঘটনা। ২০১২ ইং সালে সেই অঞ্চলে গিয়ে দেখি যে সব স্থানে রাসুয়্যুর লেখা ছিল সেখানে লেখা আছে رأس الخير অর্থাৎ কল্যাণের মাথা। পরবর্তীতে জানতে পারলাম যে, বর্তমান সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয সেখানে কোন এক প্রকল্প উদ্বোধন করতে এসে এই শহরের পুরাতন নাম রাসুয়্যুরের পরিবর্তে রাসুল খাইর রেখেছেন।

[4]. যেমন কারও নাম রাখ হল মিষ্টি। কিন্তু দেখা গেল তার ব্যবহার অত্যন্ত কঠোর ও নিকৃষ্ট। অপর পক্ষে কারও নাম রাখা হল তিক্ত-তিতা। কিন্তু দেখা গেল তার ব্যবহার খুবই মিষ্টি। এ ক্ষেত্রে নামের অর্থ ও নাম বহনকারী লোকের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হওয়ার কারণে এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকার কারণে মানুষের বিবেক এ সমস্ত নাম মানুষ সহজভাবে মেনে নেয় না। এমনি কারও নাম যদি রাখা হয় আসাদ (সিংহ), কিন্তু দেখা যায় সে সিংহের মত সাহসী নয়, কারও নাম যদি রাখা হয় জাওয়াদ (দানাবীর), কিন্তু সে খুবই কৃপণ, এভাবে নাম রাখা ইসলাম সমর্থন করে না।

সুন্দর নামের অধিকারীর উপর নামের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যেমন আব্দুল্লাহ, আব্দুর রাহমান ইত্যাদি নামের যেহেতু সুন্দর অর্থ রয়েছে তাই এই জাতীয় নামের কারণেও মানুষ সৎগুণাবলী অর্জন করতে পারে। অনেক সময় ভাল নামের কারণেও মানুষের ভালবাসা ও সমাদর পাওয়া যায়।

[5]. মদীনা শরীফের বহু নাম রয়েছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ (১) মদীনা, (২) দারুল হিজরাত, (৩) তাবা ও (৪) তাইবা। (৫) জাবিরাহ, (৬) মাজবুরাহ, (৭) আল-মুবারাকাহ, (৮) হারামু রাসূলিল্লাহ ইত্যাদি। আরও অনেক নাম রয়েছে, যা তার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ যে জিনিষের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য যত বেশী হয়, তার টাইটেল ও উপাধিও হয় তত বেশী হয়ে থাকে।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3865>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন